খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসবে প্রতিফলিত সমাজজীবনের স্বরূপ : একটি জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষা

রাজীব অধিকারী*

[**সারসংক্ষেপ :** লোক উৎসব লোক সমাজের সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং তা গ্রামীণ মানুষের সহজ-সরল জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। খুলনা অঞ্চলের লোক সংস্কৃতিতে লোক উৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এসকল উৎসবের ভিত্তি হলো প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও লোকবিশ্বাস। লোক উৎসবের উৎস অনুসন্ধান ও স্বরূপ বিশ্লেষণে এ অঞ্চলের ইতিহাস, সমাজজীবন, লোকাচার প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ঐতিহ্যবাহী অনেক লোক উৎসবই আজ বিলুপ্তির পথে। আর কিছু উৎসব এখনও টিকে আছে। বিশেষত, খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই টিকে থাকা ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসবগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে খুলনা জনপদে একটি জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। লুপ্তপ্রায় লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ সময়ের দাবি, এই নিরিখে খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসবগুলোকে সংরক্ষণের জন্য নীতিনির্ধারকদের প্রতি একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে।]

সংকেত শব্দ : লোক উৎসব, লোক সমাজ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষা।

ভূমিকা

লোক উৎসব লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধতম শাখা। লোক উৎসবের সাথে লোকসমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। উৎসবপ্রিয় বাঙালির জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে অসংখ্য লোক উৎসব। আর উৎসবের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে আনন্দের আবেশ। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের বিশাল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শত-সহস্র বছরের নিজস্ব বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও জীবন-যাপন প্রণালীর উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন লোক উৎসবের এবং ঐতিহ্যগত ধারায় যা এখনো বহমান। এ কারণেই শত বছরের গ্রাম বাংলার সমাজজীবনের প্রকৃত চিত্র অঙ্কনের নিমিত্তে লোক উৎসবের দ্বারস্থ হতেই হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা একটি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জেলা খুলনা। লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ বলয়ে লোক উৎসবেরও রয়েছে স্বতন্ত্র উপস্থিতি। বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবনের উপস্থিতি এ অঞ্চলের লোক উৎসবে তথা লোকসংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। বৈচিত্র্যময় পেশা, কৃষি উৎপাদন, সমুদ্র ও বননির্ভর জীবন যাপন পদ্ধতি, বিশ্বাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানের লোক উৎসবের সাথে এই অঞ্চলের কিছু লোক উৎসবের সাদৃশ্য থাকলেও পালন রীতিতে রয়েছে বিস্তর ভিন্নতা। আবার কিছু উৎসব এ অঞ্চলের একান্তই নিজস্ব। লোক উৎসব যেমন একদিকে

*প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অনাবিল আনন্দের উপলক্ষ্য, তেমনি অন্যদিকে তা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রতিটি লোক উৎসব বিশেষ বিশেষ সময় ও উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। এর সাথে জড়িয়ে থাকে লোকায়ত বিশ্বাস ও অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন। খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসবের আচরিত রীতি, উৎসবে ব্যবহৃত উপকরণাদি, পালনকারী গোষ্ঠী, বিভিন্ন লোক উৎসব সম্পর্কে রচিত গান ও ছড়া প্রভৃতির মাধ্যমে এই অঞ্চলের সমাজজীবন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের লোক উৎসবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে বহুকাল ধরে চলে আসা গ্রামীণ মানুষের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। অতীত সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত বর্তমানের সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

খুলনা অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি এ অঞ্চলের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। আর লোকউৎসব এ অঞ্চলের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হলো:

প্রথমেই প্রথিতযশা ঐতিহাসিক শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র এর *যশোহর-খুলনার ইতিহাস* **১ম** ও **২য়** *খণ্ড* বইটি সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। খুলনা ও যশোর জেলা সম্পর্কে জানার জন্য এটি একটি আকর গ্রন্থ। খুলনার নামকরণ ও সুন্দরবন সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি বৈদিক যুগ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে। লোকসাহিত্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলেও এ অঞ্চলের লোকউৎসব বিষয়টি অনালোচিত থেকে গেছে। লোক উৎসব বিষয়ে কোন আলোচনা বইটিতে লক্ষ করা যায় না। শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য* এবং মিহির চৌধুরী কামিল্যার লেখা *বাংলার লোক সংস্কৃতি: স্বাদে-আস্বাদে* গ্রন্থ দুটিতে গ্রাম বাংলার লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ আছে। তথাপি লোক উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় না। *বাংলাদেশের উৎসব: শান্তি ও সম্প্রীতির অহংকার* গ্রন্থে ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন বাংলাদেশের প্রধান চারটি ধর্মের (ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম) ধর্মীয় উৎসব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় লোক উৎসবের ভূমিকার বিষয়টি আলোচিত হয়নি। ড. মুনতাসীর মামুন তাঁর *বাংলাদেশের উৎসব* গ্রন্থে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় উৎসব নিয়েই আলোচনা করেছেন। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. সৌমিত্র শেখর তাঁর *লোক উৎসব নবান্ন* গ্রন্থে 'নবান্ন' কীভাবে লোক-পার্বণ থেকে লোক উৎসবে পরিণত হলো সে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক বছরের ইতিহাসে লোক উৎসব নবান্ন আয়োজনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে একটি মাত্র লোক উৎসব ছাড়া আর কোন লোক উৎসব সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়নি। *বাংলার লোক উৎসব বেড়া ভাসান* গ্রন্থে ফাহ্‌মিদা হক ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের একটি লোক উৎসব বেড়া ভাসান নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও মাত্র একটি লোক উৎসব নিয়ে লিখিত এই গ্রন্থ তথাপি এ-গ্রন্থে লোক উৎসব নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। লোক উৎসবের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য বিষয়েও লেখক আলোচনা করেছেন। কিন্তু খুলনার লোক উৎসব বা সমাজজীবন নিয়ে কোন আলোচনা এতে স্থান লাভ করেনি।

ওয়াকিল আহমেদ রচিত *বাংলার লোক সংস্কৃতি* এবং শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *লোকজ সংস্কৃতির গ্রন্থমালা: খুলনা* গ্রন্থ দুটিতে লোকসংস্কৃতি ও খুলনার লোক উৎসব নিয়ে আলোচনা লক্ষ করা যায়। লোক উৎসব শব্দটি সরাসরি ব্যবহার না করলেও বিভিন্ন আলোচনায় খুলনা অঞ্চলের কিছু লোক উৎসবের বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। লোক উৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত কিছু

লোক-গানের উল্লেখও এতে রয়েছে। এ সকল লোক উৎসবের মাধ্যমে সমাজজীবন সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করা সম্ভব, সে বিষয়টি আলোচিত হয়নি। খুলনার লোক উৎসব শিরোনামে আলাদা কোন গ্রন্থও রচিত হয়নি। বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর কোনো-কোনোটিতে লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তবে লোক উৎসব নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়নি। আবার কোনো গ্রন্থে লোক উৎসব নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হলেও সেখানে আবার খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসব নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। *লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : খুলনা* গ্রন্থে খুলনার লোক উৎসব নিয়ে আলোচনা করা হলেও লোক উৎসবে প্রতিফলিত সমাজ জীবনের স্বরূপ নিয়ে কোন আলোচনা নেই। খুলনা অঞ্চলের লোক মানুষের জীবনের সাথে একান্ত সম্পর্কিত উৎসবগুলো অনুসন্ধান করা এবং সে সকল উৎসবে প্রতিফলিত সমাজ জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই এই গবেষণা।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য লোক উৎসব, যা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সংহতি বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কালের বিবর্তনে অনেক সমৃদ্ধ লোকউৎসব ইতোমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। খুলনা জেলার লোক উৎসবগুলো অনেকাংশে বিলুপ্ত প্রায়। এধরনের তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্যগুলোকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে। যাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমৃদ্ধ লোক উৎসব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

"খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসবে প্রতিফলিত সমাজজীবনের স্বরূপ : একটি জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণাটি জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ২০২২ সালের শেষ থেকে ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে আনুমানিক ছয় মাসব্যাপী অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষায় ২টি উঠান বৈঠক আলোচনা কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। পাশাপশি অ-কাঠামোগত প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৬০ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি উপজেলা থেকে দুইজন করে সত্তরোর্ধ বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

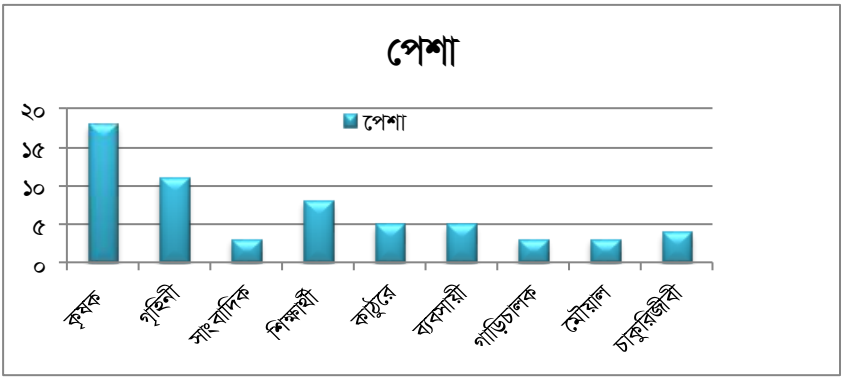
গবেষণা এলাকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি জেলা খুলনা। ভৌগোলিকভাবে জেলাটি ২১°৪১ থেকে ২৩°০০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৪ থেকে ৮৯°৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এর উত্তরে যশোর ও নড়াইল জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বাগেরহাট জেলা, পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলা। বর্তমানে খুলনা জেলায় নয়টি উপজেলা রয়েছে। খুলনা একটি প্রাচীন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে পরিচিত। এর বৈচিত্র্যময় লোকজসংস্কৃতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ঋদ্ধ করেছে। উক্ত কারণে এই গবেষণার গবেষিত স্থান হিসেবে খুলনা জেলাকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

পেশাভিত্তিক তথ্যদাতা

গবেষণাটি পরিচালনার সময় মোট ৬০ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ রয়েছেন। তার মধ্যে কৃষক- ১৮ জন,

গৃহিনী- ১১ জন, সাংবাদিক- ৩ জন, শিক্ষার্থী- ৮জন, কাঠুরে-৫ জন, ব্যবসায়ী-৫ জন, গাড়িচালক- ৩ জন, মৌয়াল- ৩ জন, চাকুরিজীবী- ৪ জন। (চিত্র: ৪)



চিত্র: ৪ পেশাভিত্তিক তথ্যদাতা

বাংলাদেশের লোক উৎসবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

উৎসব হলো এমন একটি উপলক্ষ্য যার মাধ্যমে একদিকে লোকচিত্তের আনন্দ প্রকাশিত হয় এবং অন্যদিকে লোকসমাজের সংহতি সাধিত হয়। উৎসবের ইংরেজি প্রতিশব্দ Festival। Festival শব্দটি ব্যাপক অর্থগ্রাহী হিসেবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এটি সমাজের সাথে সম্পর্কিত, সামষ্টিক বিষয়। সাধারণত উৎসব বলতে সামাজিক, ধর্মীয়, এবং ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে পালিত আনন্দ অনুষ্ঠানকে বোঝায়। (নাঈমুল, ২০২০ : ১১)

মানুষ আদিকাল থেকে যেখানেই বসবাস করেছে, জীবন-যাপনের ভেতর দিয়ে সেখানেই সে তার মতো করে নিজস্ব কিছু বিশ্বাস অঙ্গীকার করেছে, কিছু আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ-বর্জন করেছে, কিছু উৎসবের জন্ম দিয়েছে। আর মানুষের নিঃসঙ্গ একাকিত্বের দিন থেকে সামষ্টিক জীবনে উত্তরণের পথ ধরেই সৃষ্টি হয় উৎসবের (দুলাল, ২০০৪ : ২৮৫)। উৎসব শব্দটির উচ্চারণমাত্রই হাজির হয় অজস্র আনন্দের অনুষঙ্গ। তবে এই আনন্দের স্বরূপ কী, এর ব্যাপকতা বা অভিলাষ কেমন সে বিষয়ে অভিধানে বিস্তর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এ কারণে একেবারে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে কোন আনন্দজনক অনুষ্ঠানকে যেমন উৎসব বলা হয় তেমনি সমাজের আর দশজনকে নিয়ে কৃত অনুষ্ঠানকেও উৎসব বলা হয় (আতোয়ার, ১৯৮৫ : ৯)। প্রতিটি উৎসবেরই রয়েছে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব ।

উৎসবপ্রিয় বাঙালি সমাজে নানা রকমের উৎসবের মাঝে লোক উৎসব এক বিশাল স্থান জুড়ে রয়েছে। ঐতিহ্য-নির্ভর লোকসমাজ লোক-বিশ্বাসের উপর ভর করে উদ্দীপনার সঙ্গে আনন্দময় পরিবেশে যে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তাকে সাধারণ ভাষায় লোক উৎসব বলে। লোক উৎসবের ইংরেজি প্রতিশব্দ Folk Festival। Folk এর প্রতিশব্দ রূপে 'লোক' শব্দের স্বীকৃতি প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য (তুষার, ১৯৮৫ : ৫)। আর প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসরত অক্ষরজ্ঞানহীন ঐতিহ্যানুসারী বৃহত্তর গ্রামীণ জনসমষ্টিকে 'লোক' বলে অভিহিত করা হয়। আর এই 'লোক' জীবনে আনন্দ লাভের জন্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যে উৎসব পালন করে তাই লোক উৎসব। বাংলা পিডিয়ায় লোক উৎসব সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভোজ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়েই

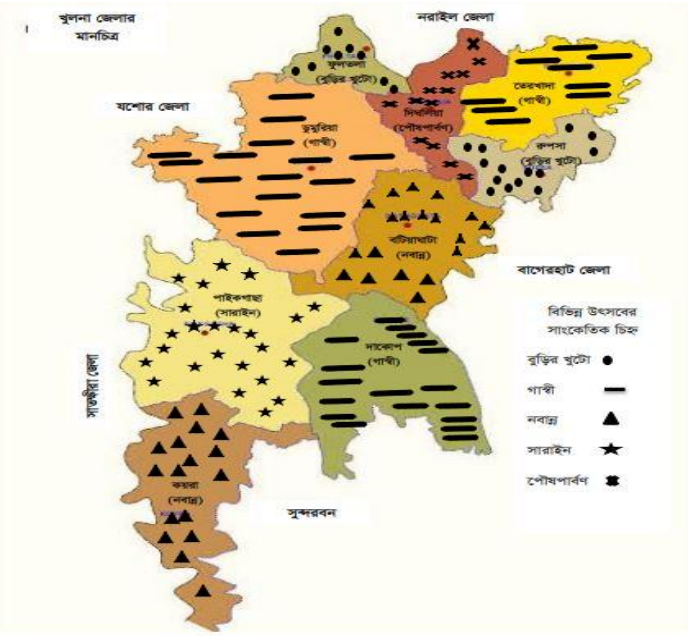
মূলত এর প্রচলন হয়েছে। প্রাচীনকালে শিকারকৃত পশুর মাংস একত্রে বসে ভোজন করা এবং নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান পালিত হতো। পরবর্তীকালে কৃষি ও পশু পালন স্তরে এসে লোক উৎসবের নতুন মাত্রা লাভ করে এবং বিভিন্ন সময়ে যুগের দাবি অনুযায়ী বিভিন্ন লোক উৎসবের সৃষ্টি হয়। (মোমেন, ২০০৩ : ৩৩০)

লোক উৎসবে একদিকে যেমন থাকে আনন্দঘন, উৎসবমুখর, ভোজ বা বৈচিত্র্যময় খাবার দাবারের সমাগম, তেমনি এর অন্যতম উপজীব্য হচ্ছে নানা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্ম। যা মানব-মনের নানা বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে উদ্ভূত। যদিও বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু দীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করার ফলে কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশ্বাস সমাজস্থ লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। (পরিমল, ২০০১: ৮৫)

খুলনা জেলার লোক উৎসব

বর্তমান খুলনা জেলা প্রাচীন বঙ্গ জনপদের অধীন ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে এ অঞ্চলে হাজার বছরের জনবসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। খুলনার পূর্বের নাম ছিল জাহানাবাদ। রূপসা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা খুলনা সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত। ১৮৪২ সালে খুলনা যশোহর জেলার অন্তর্গত মহকুমা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৮২ সালে খুলনা জেলার মর্যাদা লাভ করে। এই জেলার মোট জনসংখ্যা ২৩১৮৫২ জন (আদমশুমারি ২০১১)। এ অঞ্চলের বসবাসকারী জনসমষ্টির জীবনযাপন পদ্ধতি, পেশা, বিশ্বাস, আচার-আচারণ, পোশাক, খাদ্য প্রভৃতির মাধ্যমে এখানকার হাজার বছরের সংস্কৃতির বিনির্মাণ হয়েছে। এই সংস্কৃতিতে লোক উৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। লোক উৎসবের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুলনার বিস্মৃত সমাজজীবনের স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব।

লোক উৎসব সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি নয়। হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য লোক উৎসবের। মানুষ তার নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে একদিকে যেমন সমষ্টিবদ্ধ হয়েছে ও সংহতি স্থাপন করেছে অন্যদিকে তেমনি নিজেদের প্রয়োজনেই জন্ম দিয়েছে নানা লোকাচার ও প্রথার, যা ধীরে ধীরে লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে (ফাহমিদা, ২০০৭ : ২)। কাজেই এ সকল লোক উৎসব ও তার পালন রীতিকে বিশ্লেষণ করলে এ অঞ্চলের শত শত বছরের সমাজ জীবনের ইতিহাস জানা সম্ভব। খুলনা অঞ্চলে এমন কিছু লোক উৎসব পালন করা হয় যা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে অনুপস্থিত। আবার কিছু উৎসব দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে, স্বতন্ত্র আঙ্গিকে খুলনা অঞ্চলে পালিত হয়। খুলনা জেলার মধ্যেও এই বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। একই উৎসব খুলনা জেলার একেক অংশে এক এক নামে পালিত হয়। খুলনা জেলার নয়টি উপজেলার প্রতিটি গ্রামে সারা বছরই কোন না কোন লোক উৎসব পালিত হয়। আবার কোন এলাকার জনগণ অনেক উৎসব পালন করলেও কোন বিশেষ একটি লোক উৎসবকে সর্বাধিক আড়ম্বরের সাথে পালন করে। খুলনা জেলার উপজেলাগুলোতে যেসব লোক উৎসব বেশি জনপ্রিয় বা সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে পালন করা হয় তা জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুলনা জেলার মানচিত্রে উল্লেখ করা হলো :



[উৎস: গবেষক কর্তৃক ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য]

খুলনা জনপদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর লোক উৎসবগুলো নিছক আনন্দ লাভের জন্য পালন করা হয় না, বরং এর সাথে সামাজিক ঐক্য এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়গুলোও পর্যবেক্ষণে লক্ষণীয়। জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষায় প্রাপ্ত খুলনা জেলার লোক উৎসবগুলোর পরিচয় ও বিশেষত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

লোক উৎসব

বিবাহ, বাসি বিবাহ, পাকা দেখা, গা ধোয়ানো, দধি মঙ্গল, ভাই ফোটা, চতুর্থী, শ্রাদ্ধ/খরজ, স্বাধ খাওয়ানো, জামাই ষষ্ঠী, গাম্বী/ ঢ্যাপ ফুটানো, বুড়ির খুটো/ বোমা ঘোরানো, সারাইন/ ধানের স্বাদ খাওয়ানো, জাইলে পাটোই/পৌষ পার্বণ, নবান্ন, জোনাক, ব্যাঙের বিয়ে, ফুলঢালা/ ভাটিঢালা/ কুলোবিয়ে, পোলো চাপানো/বাউত, ভূত চতুর্দশী, আমাবতি/আম্বুবাচী, পহেলা বৈশাখ/ নববর্ষ, বনবিবি/বনদেবী, ঘুড়ি উড়ানো, নৌকা বাইচ উৎসব ইত্যাদি।

খুলনা জেলার উল্লেখযোগ্য লোক উৎসবের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি লোক উৎসবের আলোচনা করা হলো:

বুড়ির খুটো বা বোমা ঘুরানোর উৎসব : এটি খুলনা অঞ্চলের একটি খুবই জনপ্রিয় লোক উৎসব।
সময়: কার্তিক মাসের শেষ দিন।
উদ্দেশ্য : প্রধানত আনন্দ লাভ। তবে কোন কোন স্থানে মশা মাছি তাড়ানোর জন্য এবং পেটের পীড়া থেকে মুক্তির আশায়ও এই উৎসব পালন করা হয়।

উপকরণ: খেজুরের ফ্যাতরা, বাঁশের ফ্যাতরা, বাঁশের কঞ্চি, বেত, নারিকেলের আচা, কলার শুকনা পাতা, লাঠি, বেল, নাটা, কেরোসিন তেল।

উৎসবটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, কবে থেকে উৎসবটি পালন করা শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে কারোর কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। এ বিষয়ে রূপসা উপজেলার শঙ্কর দে বলেন, "পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে এ উৎসবটি আমরা বছরের পর বছর পালন করে আসছি" (২৩ ডিসেম্বর, ২০২২)। খুলনা জেলার রূপসা, ফুলতলা সহ বেশ কিছু স্থানে এটি পালিত হয়। তবে স্থানভেদে পালন রীতিতে সামান্য রকমফের লক্ষ করা যায়।

কার্তিক মাস শেষ হওয়ার দিন সন্ধ্যার পর এই উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সারাদিনের প্রস্তুতি শেষে সন্ধ্যা হলে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই যার যার বোমা নিয়ে উৎসবে যোগ দেয়। বোমা একটি আঞ্চলিক শব্দ। সাধারণত দুই থেকে তিন হাত লম্বা বাঁশের কঞ্চি বা বেত নিয়ে তার এক প্রান্তে নারকেলের আচা বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর খেজুরের ফ্যাতরা, বাঁশের ফ্যাতরা, নারিকেলের ফ্যাতরা প্রভৃতির মাঝ বরাবর ছিদ্র করে বাঁশের কঞ্চির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে আর একটি নারকেলের আচা কঞ্চির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এর ফলে এটি স্তুপ এর আকার ধারণ করে এবং এক প্রান্ত ১.৫-২ হাত কঞ্চি অবশিষ্ট থাকে যা ধরে ঘোরানো হয়। এর নামই বোমা।

সাধারণত ধান কাটার পর যে খোলা মাঠ থাকে এ সময় সেখানেই আয়োজন করা হয় এই উৎসবের। খোলা মাঠের মধ্যে বাঁশ, লাঠি, কলার শুকনা পাতা, খড় প্রভৃতি দিয়ে বুড়ির ঘর নামে অস্থায়ী ঘর বানানো হয়। খড় দিয়ে বুড়ো ও বুড়ি বানিয়ে এই ঘরের মধ্যে রাখা হয়। সেই সাথে বেল, নাটা প্রভৃতি ফলও রাখা হয় ঘরে। সন্ধ্যার পরে সবাই মিলে বুড়ির ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর নিজ নিজ বোমা এই আগুন দিয়ে ধরিয়ে নিজের চারদিকে ঘোরাতে শুরু করে। এ সময় একটি শ্লোক বলা হয়। শ্লোকটি এরকম:

বুড়ির খুটো খোলসের মুড়ো
মশা মাছি দৌড়ায়ে বেরো
অন্যের বাড়ি যা
মাছের মুড়ো খা। (তাপস রায়, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২)

যত সময় বোমায় আগুন থাকে ততো সময় তা ঘোরানো হয়। এরপর বুড়ির ঘরের আগুন নিভে গেলে আগুনে পোড়া বেল ও নাটা সবাই ভাগ করে খায়। এটি খুবই উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হয়।



চিত্র (১) : বুড়ির খুটো উৎসবের আলোকচিত্র (স্থান ফুলতলা, খুলনা ২০২২)

গাম্বী বা ঢ্যাপ বাড়ানোর উৎসব : গাম্বী খুলনা অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব। খুলনা জেলার প্রায় প্রতিটি স্থানেই গাম্বী বা ঢ্যাপ বাড়ানোর উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবটি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও পালন করা হয়। তবে অন্যান্য স্থানের চেয়ে ভিন্নভাবে খুলনা অঞ্চলে পালিত হয়। বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বন্ধ্যা গাছে ফল ফলানোর জন্য গাম্বী উৎসব পালন করা হয়। এই লোক উৎসবের আচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে পল্লি কবি জসীম উদ্‌দীন তার *আত্মজীবনী*তে লিখেছেন, "গাম্বীর রাত্রে আমরা যে গাছে ফল ধরে না, একটি কুড়াল লইয়া সেই গাছে দু একটি কোপ দিতাম আর বলিতাম, এই গাছে ফল ধরে না, এই গাছ আজ কাটিয়া ফেলিব। আর একজন যাইয়া বলিত, না না কাটিস না, এবছর ফল ধরিবে। তখন নিরস্ত হইতাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল এরূপ করিলে গাছে ফল ধরবে" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৪ : ১৬)। কবি জসীম উদ্‌দীনের প্রদত্ত বর্ণনার মতো এই একই আচার খুলনা অঞ্চলে গাম্বীর রাতে পালন করা হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী হিন্দু কৃষক-সমাজে আশ্বিন সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় 'গার্সিব্রত' বা 'গারুই ব্রতের' উল্লেখ করেছেন যার লক্ষ্য হল গাছকে সাধ খাওয়ানো (চিন্তাহরণ, ১৯৫২ : ১০)। গাছকে সাধ খাওয়ানোর জন্য 'গারসে ষষ্ঠী' অনুষ্ঠান পালনের কথা বলেছেন অমলেন্দু মিত্র (অমলেন্দু, ১৯৭২ : ১০)। অনুসন্ধানে লক্ষ করেছি যে, খুলনা অঞ্চলের অনেক স্থানেই আশ্বিন মাসের শেষে গাম্বী নামে যে উৎসব হয় সেটি ধানকে সাধ খাওয়ানোর জন্য করা হয় না বরং এর উদ্দেশ্য ভিন্ন। আশ্বিন মাসের শেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে আরো একাধিক লোক উৎসব পালন করা হয়। তার মধ্যে ধানের সাধ খাওয়ানো উৎসবও আছে। খুলনা অঞ্চলে নিজস্ব ধারায় প্রাচীনকাল থেকেই গাম্বী উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে। খুলনায় যেভাবে গাম্বী পালন করা হয় তা তুলে ধরা হলো :

সময় : আশ্বিস মাসের শেষ দিন।
উদ্দেশ্য : ফসল বৃদ্ধির আশা, ইঁদুর, সাপসহ ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় তাড়ানো এবং রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি।
উপকরণ: সুপারির খোলা, দড়ি, তালের আঁটি, নিমপাতা, কাঁচা হলুদ, পান।
খুলনা অঞ্চলে এটি ঢ্যাপ বাড়ানোর উৎসব নামেও সুপরিচিত। তবে কবে থেকে এটি পালন করা শুরু হয় তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ঐতিহ্য অনুসারে এটি পালিত হয়ে আসছে। উৎসবটিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হলো:

১ম পর্ব: আশ্বিন মাসের শেষ দিন সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত এমনকি পরদিন সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ঢ্যাপ ফোটানো হয়। ঢ্যাপ একটি আঞ্চলিক শব্দ। সদ্য গাছ থেকে পড়া সুপারির খোলা থেকে পাতা আলাদা করে খোলটাকে ফাঁপা করে পেঁচিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। এরপর পাতা ফেলে দেওয়া ডাটা ধরে মাটিতে জোরে জোরে বাড়ানোর (আঘাত) হয়। এর ফলে জোরে জোরে শব্দ হয়। এর নাম ঢ্যাপ বাড়ানোর। ঢ্যাপের থেকেই উৎসবটির নাম হয়েছে ঢ্যাপ বাড়ানোর উৎসব। এ সময় একটি ছড়া কাটা হয়।

ইন্দুর বান্দর দূর যা
শিয়েল শগুন মারে খা
মশা মাছি দূরে যা
মরে সব চুয়া হ। (পারুল, ৩ জুন, ২০২২)

লোকমনে বিশ্বাস আছে যে, যতদূর এই ঢ্যাপের শব্দ যাবে ততোদূর পর্যন্ত ফসলের জন্য ক্ষতিকারক ইঁদুর, কীটপতঙ্গ, সাপ ও অন্যান্য মশা মাছি মরে যায় বা দূরে চলে যায়।



চিত্র (২) : ঢ্যাপ বাড়োনো উৎসবের আলোকচিত্রঃ (স্থান রূপসা, খুলনা ২০২২)

২য় পর্ব : আশ্বিন মাসের শেষ দিন ভালো ভালো খাবার রান্না করা হয়। তবে তা সেদিন খাওয়া হয় না। এই খাবার পরের দিন কার্তিক মাসের প্রথম দিন সকালে খাওয়া হয়। এই নিয়ে স্থানীয় ছড়া আছে।

আশ্বিন মাসে রান্ধে বুড়ি
কার্তিক মাসে খায়
যে বর চায় বুড়ি
সেই বর পায়। (লক্ষ্মী বৈরাগী ৩ জুন, ২০২২)

৩য় পর্ব : ঢ্যাপ বাড়োনো শেষে কার্তিক মাসের প্রথম দিন সকালে কাঁচা হলুদ, নিমপাতা ও পান বেঁটে ছেলে-বুড়ো সকলেই গায়ে মাখে। এরপর কিছু সময় রৌদ্রে শুকিয়ে স্নান করে ফেলে। স্নান সেরে এসে পূর্বের দিন রান্না করে রাখা খাবার খায়। লোক বিশ্বাস যে এর ফলে খোস-পাঁচড়া, এগজিমা, চুলকানিসহ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৪র্থ পর্ব : গাম্বী অনুষ্ঠান শেষে বছরে প্রথমবার তালের আঁটি কেটে খাওয়া হয়। এর পূর্বে সাধারণত তালের আঁটি খাওয়া হয়না। সারা বছর পাঁকা তাল খেয়ে আটিগুলো জমিয়ে রাখা হয়। আটিতে গজ (অঙ্কুর) আসলে কেটে খাওয়ার উপযুক্ত হয়। এই দিন তালের আটি রোপণ করার রীতিও প্রচলিত আছে। লোক বিশ্বাস যে বজ্রপাতের সাথে তাল গাছের সম্পর্ক আছে তাই এই দিন তালের আঁটি লাগানো হয়।

এ অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব গাম্বী। অনেক জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে উৎসবটি পালন করা হয়। এ উৎসবের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের সমাজ জীবনের অনেক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালের বিবর্তনে জনপ্রিয় এ লোক উৎসব আজ বিলুপ্তির পথে।

সারাইন বা ধানের সাধ উৎসব : সারাইন খুলনা অঞ্চলের আশ্বিন মাসের শেষ সময়ে পালিত একটি উৎসব। খুলনার পাইকগাছায় এটি সারাইন নামে পরিচিত, রূপসায় ধান সাধ এবং বটিয়াঘাটাতে আশ্বিনী সংক্রান্তি নামে পরিচিত। ভালো গাছ ও অধিক ফলনের প্রত্যাশায় এই উৎসবটি পালন করা হয়।

সময়: আশ্বিন মাসের শেষ এবং কার্তিক মাসের শুরুতে।

উদ্দেশ্য: সুস্থ গাছ এবং অধিক ফলনের প্রত্যাশা।
উপকরণ: সোলার ফুল, পাটকাটি, কলার পাতা, বিভিন্ন ফল, মিষ্টি, ফুল, আমের পাতা, সুগন্ধি।

খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্বিন মাসের শেষে রোপা আমন ধানের চারায় নতুন ধানের সৃষ্টি হয় বা ধান গাছের গর্ভে শীষের উদ্‌গম হয়। কোন নারী গর্ভধারণ করলে যেমন তাকে সাধ ভক্ষণ করানো হয় তেমনি এ সময় ধান গাছকেও সাধ খাওয়ানো হয়। খুব ভোরে স্নান করে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে বিভিন্ন ফল, মিষ্টি, ফুল ইত্যাদি কলার পাতায় করে ধান গাছের গোড়ায় রাখা হয়। শোলা দিয়ে তৈরি ফুল পাটকাঠিতে বেঁধে ধান ক্ষেতে পুঁতে দেওয়া হয়। অধিক শস্য প্রাপ্তির জন্য পালিত হয়। এ উৎসবের প্রমাণ ছড়াতেও পাওয়া যায়।

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
সকল শস্যের গর্ভ বসে
রামের হাতে গুমা
ধান হইলো তিন গুনা। (আশুতোষ, ১৯৬২ : ৬০০)

কামিনী কুমার রায় ছড়ায় উক্ত গুমা শব্দ ধরে একে 'গুমা দেওয়া' উৎসব বলেছেন (ওয়াকিল, ২০১২ : ১৬৭)। শ্রী শংকর সেনগুপ্ত এটিকে আমন ধানের সাধ দেওয়া অনুষ্ঠান বলেছেন (শংকর, ১৯৭২ : ৩০৪)। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষেতকে তুষ্ট করে অধিক ফলন প্রত্যাশা করা হয়। এ প্রসঙ্গে লোক ছড়ায় উল্লেখ পাওয়া যায় :

আমরা মন্দা বটের পাতা
ধান রুইছে আড়াই কাঠা
ধানরে সাধ খাওয়া
সকল ভূঁইতি আইল বাইল
আমার ভূঁইতি ভরা বাইল
ধানরে সাধ খাওয়া। (কিংকরী, ১৪ অক্টোবর, ২০২২)

কৃষি প্রধান এ অঞ্চলে কৃষি ফসলের মঙ্গল সাধনে উৎসব মুখর পরিবেশে এ উৎসবটি পালিত হয়। বর্তমানে বটিয়াঘাটা উপজেলার কিছু কিছু স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই উৎসবটি অনেকটা ধর্মীয় আচার যুক্ত করেই পালন করছেন। এ প্রসঙ্গে শৈলমারী গ্রামের অধির বৈরাগী বলেন যে, "ধানের সাধ অনুষ্ঠানটি এখন অনেকটাই পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পালন করা হয়। ধর্মীয় আচারের অনেক বিষয় যুক্ত হয়েছে পালন রীতিতে" (অধির, ২৫ নভেম্বর, ২০২২)। পাইকগাছা উপজেলাতে সারাইন উৎসবে খেজুরের ছিটাতে কাপড় পেঁচিয়ে আগুন ধরিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয় এ সময়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উৎসব পালন করেন (রবিন, ৬ জানুয়ারি, ২০২৩)। ফসলের মঙ্গল চিন্তার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখে।

জাইলে পাটোই বা পৌষ পার্বণ উৎসব : বাংলার একটি জনপ্রিয় উৎসব পৌষ পার্বণ। খুলনা অঞ্চলে এটি পৌষ সংক্রান্তি ও জাইলে পাটোই নামেও পরিচিত। গ্রামীণ সমাজ জীবনে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে এ লোক উৎসব।

সময় : পৌষ মাসের শেষের দিন
উদ্দেশ্য : আনন্দ লাভ, পিঠাপুলি খাওয়া, সামাজিক ঐক্য।

পৌষ মাস শেষ হওয়ার ৩ দিন বা ৭ দিন আগে থেকে বাচ্চাদের ৪ থেকে ৬ জনের দল এবং বড়দের ৮ থেকে ২০ জনের দল ঢাক, বাঁশি, জুড়ি, জাহাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি

গিয়ে 'হাসে' গেয়ে চাল ও টাকা সংগ্রহ করে। 'হাসে' একটি আঞ্চলিক শব্দ। পৌষ মাসের শেষে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে গান গাওয়া হয় তাকে হাসে বা হালই গান বলে। এই গানের সুর তাল স্বতন্ত্র। এই গানের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের সমাজ জীবনের অনেক চিত্রই ফুটে ওঠে। খুলনা অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি হাসে গানের উল্লেখ করা হলো:

১. ভোলার গান

ও ভোলা কেঁদে কেঁদে কয় ও ভোলার বৌতো ভালো নয়।
সারাবছর মাটি কেটে ভোলা শুধো রুটি খায়।
ও সে জৈব মাটির জমি তাতে ফসলের খনি।
পারালিতে ধান খেয়ে যায় উপায় কি করি আমি
ও আমি উপজেলায় যাই, উপজেলাতে গিয়ে আমি অফিসে জানাই
হায় হায় ওরে, অফিস থেকে ঔষধ এনে জমিতে ফসল ফলাই। (বন্ধনা বিশ্বাস, ২৫ নভেম্বর, ২০২২)

২. মাঝি ও যাত্রীর গান

হায় হায় ওরে, শুন সবে ভক্তিভরে করি নিবেদন
হায় হায় ওরে,পার করো পার করো কানাই বেলার পানে চেয়ে
যদি দুগ্ধ হলো নষ্ট রবি গেল বয়ে।
তুমিতো সুন্দরও কানাই তোমার ভাঙা নাও।
কোথায় রাখবো দুগ্ধের বাসর কোথায় রাখবো পাও
আগা নৌকায় থোও বাসর খান মধ্যি ডরায় বসো
সেচি ধরে ফেলো জল লজ্জা কেনো করো। (মমতা বিশ্বাস, ২৬ নভেম্বর, ২০২২)

৩. হাদুরামের গান

এক বেটা তামক খায়
খুশ খুশায়ে কাসে
আর এক বেটা লক্ষী ছাড়া
ঘেটু ধরে ঠাসে
ওসে চিক দানার মালা
তোর জ্বালাতে পাগল হলো
হাদুরাম বালা। (শান্তীলতা, ১৯ নভেম্বর, ২০২২)

পৌষ মাস শেষের দিন সংগৃহিত চাল ও টাকা দিয়ে একত্রে খোলামাঠ বা বনের ধারে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। কোথাও কোথাও হিন্দু রাখালরা লক্ষ্মীর নামে ছড়া কাটে আর মুসলিম রাখাল ছেলেরা মানিক পীরের নামে গান গেয়ে পৌষ মাসে সন্ধ্যার পর বাড়ি বাড়ি মাগন করত।

রূপসা থানার ঘাটভোগ ইউনিয়নে রাজবংশী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জেলে সম্প্রদায়ের লোকেরা পৌষ মাসের শেষে জাইলা পাটোই নামে একটা লোক উৎসবের আয়োজন করে। পিঠাপুলির পাশাপাশি বিরাট মেলাও বসে। অগণিত মানুষের সমাগম হয় সেখানে। এই উৎসবের বিষয়ে বিনয় রাজবংশী বলেন, মূলত বছর শেষে একত্রে আনন্দে মিলিত হওয়ার জন্যই এই উৎসব পালন করা হয় (বিনয়, ১৫ জুলাই, ২০২২)। বর্তমানে এ উৎসবের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয় ঢুকে পড়েছে। পৌষ সংক্রান্তিতে এই অঞ্চলে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। চিতোই পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, কলা বড়া, চন্দোসা, পাতা পোড়া, রসের পিঠা ইত্যাদি সুস্বাদু পিঠা ও পায়েস তৈরি করা হয়। বাড়ির বিবাহিত মেয়ে-বোনদের নিমন্ত্রণ করে আনা

হয়। নিমন্ত্রণ করা হয় প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয়দের। একত্রে আনন্দে মিলিত হয় পিঠা খাওয়ার জন্য। এদিন প্রতিটি বাড়ি পরিষ্কার করে আলপনা আঁকা হয়।




চিত্র (৩) : পৌষ পার্বনের পিঠাপুলির আলোকচিত্র (স্থান, রূপসা, খুলনা ২০২২)

ব্যাঙের বিয়ে বা বৃষ্টি আহ্বান : যখন সেচ ব্যবস্থা ছিল না, তখন চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির পানিই ছিল একমাত্র ভরসা। সময়মত পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে কৃষি জমি চাষ করা যায় না। বীজ বোনা যায় না এমনকি ফসলও ভালো হয় না। বৃষ্টির এমন গুরুত্ব থেকে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে বৃষ্টির কেন্দ্রিক বিভিন্ন লোকাচার গড়ে উঠেছে। খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি প্রত্যাশায় প্রতিবছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্যাঙের বিয়ে উৎসব পালন করা হয়।

সময় : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
উদ্দেশ্য : বৃষ্টির আহবান
উপকরণ : দুটি ব্যাঙ, কলাপাতা, বিবাহের উপকরণ।

কবে থেকে উৎসবটি শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বর্ষাকালে নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে ভরে গেলে ব্যাঙের চলাফেরা ও খাবার সংগ্রহ করতে সহজ হয়। বৃষ্টি হলেই প্রচুর ব্যাঙ ডাকে। এ থেকে মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে ব্যাঙ ডাকলেই বৃষ্টি হয় এবং ব্যাঙের সাথে বৃষ্টির একটা সম্পর্ক আছে। খনার বচন আছে-

ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন
শীঘ্রই বৃষ্টি হবে জান (Tomonash, 1935 : 232)

যখন বৃষ্টির অভাবে প্রচণ্ড তাপদাহে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে যায়। বর্ষার মৌসুমেও বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায় না। পানির অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হয়, তখন এই অঞ্চলে বড় কোনো গাছের তলে বা রাস্তার মোড়ে ব্যাঙের বিয়ের উৎসব করা হয়। এ সময় গ্রামের সকল লোক একস্থানে জড়ো হয়ে মাটিতে দুটি গর্ত করে একটিতে পুরুষ সোনা ব্যাঙ এবং অন্যটিতে স্ত্রী সোনা ব্যাঙ রাখে। মানুষের বিয়ের সময় বর কোণে কে যেভাবে সাজানো হয় ঠিক অনুরূপভাবে ব্যাঙ দুটিকে সাজানো হয়। এরপর গর্তের মুখ কলা পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এ সময় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হয়। যথা:

না হলে বৃষ্টি, ধ্বংস হবে সৃষ্টি
ক্ষেত গেছে শুকায়, বৃষ্টির আশায় দিচ্ছি ব্যাঙের বিয়ে

ও ব্যাঙ তুই বৃষ্টি আন, ফসল ফললে বাজবে প্রাণ। (মনিরুজ্জামান, ৪ মার্চ, ২০২২)

কোথাও কোথাও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ উৎসবটি লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্মের দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। বৃষ্টি প্রার্থনায় কোথাও কোথাও তাঁর পূজা করা হয়। আবার কোথাও বৃষ্টি চেয়ে গাওয়া হয় আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে গান। উৎসবটি ধর্মের চেয়ে লোকসংস্কৃতির সাথে বেশি সম্পর্কিত। লোক বিশ্বাস থেকে লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে এটি। কোন কোন স্থানে মাটিতে পানি ঢেলে কাঁদা মাটি করতেও দেখা যায় এ উৎসবে।

নবান্ন : নবান্ন সারা দেশের মতো খুলনা অঞ্চলেরও একটি জনপ্রিয় লোক উৎসব। নবান্ন শব্দের অর্থ 'নতুন অন্ন'। নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কাটার পর ধুমধাম এর সাথে পালিত হয় নবান্ন। কোথাও কোথাও পৌষ-মাঘ মাসে আমন ধান কাটার পরও এ উৎসব পালন করতে দেখা যায়। এদিন উৎসবের আমেজে সবাই খুব ভোর থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঢেঁকিতে নতুন ধানের চাল কোটা হয়। প্রতিটি বাড়িতে আঁকা হয় আলপনা।

নবান্নের দিন 'নবান্ন' নামে একটি খাবার তৈরি করে সবাইকে বিতরণ করা হয়। নতুন চালের গুড়া, নারকেল, আদার রস, আখের গুড়, চিড়া প্রভৃতি মিশিয়ে নবান্ন তৈরি করা হয় (অধির বৈরাগী, ২৫ নভেম্বর, ২০২২)। পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে নতুন চালের তৈরি খাবার কাককে খেতে দেওয়া হয়। লোক বিশ্বাস অনুযায়ী, কাকের মাধ্যমে এই খাদ্য মৃতের আত্মার কাছে পৌঁছে যায়। কাক খাবার খেয়ে কোন দিক দিয়ে উড়ে যায় সেটি লক্ষ্য রাখা হয়। কারণ জনমানুষের বিশ্বাস আছে যে, বছরের শুভাশুভ অনেকটা এর উপর নির্ভর করে। কাককে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই পর্বটির নাম 'কাকবলি'।

বর্তমানে গ্রামের পাশাপাশি শহরে এ উৎসব ঘটা করে পালিত হয়। খুলনা জেলার কোথাও কোথাও নবান্নের মধ্যে ধর্মের প্রভাব ঢুকে পড়েছে। অনেকে নবান্নের দিন লক্ষ্মীর পূজা করে। বটিয়াঘাটার হালদার বাড়িতে ধুমধাম এর সাথে নবান্ন উৎসব করা হয়। এ দিন নবান্নের সাথে হরিচাঁদ ঠাকুরের মহোৎসব করা হয়। এতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, মেলা বসে। তবে এখানে নবান্ন আর শুধু লোক উৎসব না ধর্মীয় উৎসবের সাথে যুক্ত করে পালন করা হচ্ছে।

অগ্রহায়ণের নবান্ন নিয়ে আসে খুশির বার্তা। গ্রাম বাংলার নতুন এক আবহ সৃষ্টি হয়। এ উৎসবের সাথে মিশে আছে এ অঞ্চলের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির নানা দিক। নবান্নকে কেন্দ্র করে একে অন্যের মধ্যে তৈরি হয় সামাজিক বন্ধন।

ভাটি ঢালা বা কুলা ভাসান উৎসব : ভাটি ঢালা খুলনা অঞ্চলের একটি লোক উৎসব। ফাল্গুন মাস যাওয়ার দিন এ উৎসবটি পালন করা হয়। মাস শেষ হওয়ার তিনদিন আগে থেকে গ্রামের অবিবাহিত মেয়েরা ও ছোট বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের ফুল ও কচি পাতা সংগ্রহ করে কুলোতে রেখে বটগাছ বা জিয়েল গাছের নিচে সাজিয়ে রাখে। অশোক ফুল, কুমড়ো ফুল, জবা ফুল, কলমি ফুল, নীলকণ্ঠ ফুল, ভাটি ফুল, বণ্যের ফুল, মাইক ফুল, ঘাস ফুল, গাবের কচিপাতা, ইত্যাদি কুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়। তারপর সমবেত কণ্ঠে ফুল ঢালার গান গাওয়া হয়। যথা:

হ্যাঁচরাই মাগীর প্যাঁচরাই চুল,
তাইতে দিব আমরা বলার ফুল।
বলার ফুলে যদি না লয় মন
তাইতে দিব আমরা বিড়াল হ্যাঁচরার ফুল।
বিড়াল হ্যাঁচরায় যদি না লয় মন,

তাইতে দিব আমরা চাঁপাফুল।
চাঁপা ফুলে যদি না লয় মন,
তাইতে দিব আমরা ঘণ্টা জবা ফুল
ঘণ্টা জবায় যদি না লয় মন
তাইতে দিব আমরা ভাটির ফুল। (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ৪৭৬)

দুপুর বেলা ফুলগুলো মালা গেঁথে গাছে বেঁধে দেওয়া হয়। এভাবে দুইদিন পালন করা হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ দিন সকলে গান গেয়ে কুলো মাথায় করে নিকটবর্তী নদীতে গিয়ে, ফুল পানিতে ফেলে, কুলো ধুয়ে, স্নান সেরে উক্ত গাছের নিকট আসে। তারপর একজনের কুলোর সাথে অন্য জনের কুলোর বিয়ে দেওয়া হয়। ঘা, পাঁচড়া, বসন্ত রোগ, ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে মা শীতলার করুণা লাভের জন্য এ অনুষ্ঠান করা হয়। তবে অনেক স্থানে ভাটি ঢালার ভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে গাছ আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে আসছে। বছরে অন্তত একবার গাছকে সম্মান জানানোর জন্য এ উৎসব পালন করা হয়। যেহেতু নদীতে কুলো ভাসানো হয় তাই এর আরেক নাম কুলো ভাসান। ধর্মীয় দিকটির চেয়ে এ উৎসবটি স্থানীয় লোক সংস্কৃতির সাথে বেশি সম্পর্কিত, যা এ সমাজের মানুষের মানসিকতা তুলে ধরে।

আম্বুবাচী বা আমাবতী : খুলনা অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ লোক উৎসব আমাবতী। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ দিন বা ৭ দিন এই উৎসবটি পালন করা হয়। শত শত বছর ধরে উৎসবটি এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। হিন্দু শাস্ত্রে ধরিত্রীকে মা বলা হয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হয়েছে সূর্য যে সময় মিথুন রাশিতে গমন করে সেই সময় পৃথিবী ঋতুমতি হয়। এই সময় আমাবতী পালন করা হয়। অনেকের ধারণা এই সময়টাতে পৃথিবী ও আকাশের মিলন হয় এই জন্য কোন কাজ করতে হয় না।

ঐতিহাসিক দিক থেকেও আমাবতী ও কৃষি কাজের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ প্রবাহর পর শুষ্ক পৃথিবীতে বর্ষার জল পড়ার পর মাটি উর্বর হওয়ার জন্য কয়েক দিনের প্রয়োজন হয়। আর এতে মাটি উর্বর হয়। আর উর্বর মাটিতেই উত্তম ফসল পাওয়া যায়। আমাবতীর এই সময়টাতে হাল চাষ, মাটি খোঁড়া, গাছ লাগানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকে। উর্বর জমির জন্য এই সময় ধরিত্রী মায়ের কাছে প্রার্থনা করা হয়।

সময়ের স্রোতধারায় আমাবতী পালন রীতিতেও অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে খুলনা অঞ্চলে আমাবতীর সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জামাই শশুর বাড়ি যাবে আম, কাঁঠাল, দুধ ইত্যাদি নিয়ে। আর শ্বশুর বাড়িতে জামাই এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পিঠা ও ভালো ভালো খাবার রান্না করা হয়। সাধারণত এ সময় কাজ থাকে না ফলে শ্বশুরবাড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। কোথাও কোথাও গানের আসর বসে বা বিভিন্ন লোকক্রিয়ার আয়োজন করা হয় এ সময়।

ভূত উৎসব : ভূত বিষয়টি একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। ভূত উৎসব খুলনা অঞ্চলের একটি লোক উৎসব। আশ্বিন মাসের ভূত চতুর্দশীতে এই উৎসব পালন করা হয়। এদিন গ্রামের সবাই একত্রে জড়ো হন। একজনকে ভূতের উদ্দেশ্যে খাবার দেওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি নতুন বস্ত্র পরিধান করে একটি নতুন মাটির হাড়িতে পোড়ামাছ সাথে অন্যান্য রান্না করা খাবার নিয়ে নির্জন জঙ্গলে ভূতের জন্য রেখে আসেন।

প্রচলিত আছে যে, হাড়ি রেখে আসার পথে পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না। লোকবিশ্বাস যে এই দিন পূর্বপুরুষের আত্মা পৃথিবীতে নেমে আসেন। তাদের উদ্দেশ্যেই খাবার দেওয়া হয়। আবার

কিছু এলাকার লোকবিশ্বাস যে, ভূতকে খাবার দিলে ভূত তাদের কোনো ক্ষতি করে না। এটি মূলত বিভিন্ন সমাজের ভূত বা অশরীরী আত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হওয়া উৎসব। এ উৎসব যথেষ্ট আনন্দের সাথে পালন করা হয়।

বনবিবি ও বনকেন্দ্রিক উৎসব : খুলনাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবন দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানকার অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকায় অরণ্যের প্রচুর প্রভাব লক্ষণীয়। বন-জঙ্গল শ্বাপদ-শংকুল। মানব জীবনের নিরাপত্তা এখানে অনিশ্চিত। বাঘ, সাপ, কুমির প্রভৃতির হাত থেকে নিরাপদ থাকার প্রত্যাশায় বিভিন্ন লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছে। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুসলমানদের কাছে বন বিবি, হিন্দুদের কাছে বন দেবী। এই দেবী বা বিবির অস্তিত্ব শুধু সুন্দরবন সংলগ্ন জনসমাজেই দেখা যায়। কয়রা, পাইকগাছার মানুষের জীবিকার প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে সুন্দরবন। বন থেকে মধু সংগ্রহ, গোলপাতা কাটা, মাছধরা প্রভৃতি কাজে তাদের বনে যেতে হয়। বনে হিংস্র জন্তুর বসবাস। তাই সব কাজ করে বন থেকে যেন নিরাপদে ফিরে আসতে পারে তার জন্যে বনে প্রবেশের পূর্বে বেশ কিছু লোকাচার পালন করে। কেউ কেউ বনবিবির উদ্দেশ্যে মুরগি মানত করে। কেউ আবার ফল, মিষ্টি, নতুন কাপড় নিয়ে বনে গিয়ে তার পূজা করে। এ বিষয়ে পাইকগাছা উপজেলার সোলাদানা ইউনিয়নের মোঃ আব্দুল্লাহ বলেন যে, প্রতি বছর শীতের শুরুতে এই আনুষ্ঠানিকতা না করে, কেউ বনে প্রবেশ করে না। এমনকি মাছধরার কাজও শুরু করে না (মোঃ আব্দুল্লাহ, ১৪ মে, ২০২২)।

হিন্দু মুসলমান উভয়ই ধুমধাম এর সাথে এই অনুষ্ঠান করে থাকে। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে উপকূলীয় মানুষের সংগ্রামী জীবনের চিত্র উঠে আসে।

লোক উৎসবে প্রতিফলিত সমাজজীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ

খুলনা অঞ্চলের লোক উৎসবসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ অঞ্চলের সমাজ জীবন সম্পর্কে যে চিত্র উঠে আসে তা হলো সংঘবদ্ধ জীবনে টিকে থাকার জন্য তারা নানা রীতি-প্রথা অনুসরণ করে। কালক্রমে তা লোকাচার উৎসবে রূপ নেয়। তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাগুলোকে নিম্নে সূত্রবদ্ধ করছি:

১. ভেষজ ও আয়ুর্বেদ জ্ঞান : এ অঞ্চলের লোক উৎসব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই এ সমাজের মানুষের ভেষজ ও আয়ুর্বেদ জ্ঞান ছিল। বর্তমানের মতো প্রাচীনকালে চিকিৎসা বিজ্ঞান এতো উন্নত ছিল না। মানুষ নিজের বিভিন্ন অসুখ ও শারীরিক সমস্যার সমাধান প্রাকৃতিকভাবেই অনুসন্ধান করেছে। এর প্রমাণ পাই 'গাম্বী' নামক লোক উৎসবে। এ উৎসবের শেষে এ অঞ্চলের মানুষ নিমপাতা, কাঁচা হলুদ ও পান বেটে গায়ে মাখত। উদ্দেশ্য ছিল খোসপাঁচড়া, চুলকানি, একজিমা প্রভৃতি রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা। এই ভেষজ জ্ঞান বর্তমানেও এ সকল রোগের নিরাময়ের জন্য কার্যকর বলে প্রমাণিত। বুড়ির খুটো নামক উৎসবে তারা বুড়ির ঘরে বেল ও নাটা ফল পুড়িয়ে খেতো। যাতে পেটের কৃমি সমস্যার সমাধান হয়। খুলনার গ্রাম অঞ্চলে এখনো কাঁচা বেল পুড়িয়ে খাওয়া হয় কৃমি সমস্যা দূর করতে।

২. মশা মাছি ও ক্ষতিকর প্রাণী তাড়ানোর প্রাকৃতিক কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান : বর্তমান সময়ের মতো অতীতে মশা মাছি নিধনের যন্ত্র বা স্প্রে ছিল না। কিন্তু সে সমাজেও মশাবাহিত রোগে মানুষের মৃত্যু হতো। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মশা-মাছি নিধনের কৌশল আয়ত্ত করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বুড়ির খুটো উৎসবে। একত্রে অসংখ্য লোক বোমা জ্বালিয়ে ঘোরালে এবং বুড়ির ঘর পোড়ালে অনেক ধোয়া হত। তাতে মশা মাছি ও অন্যান্য

ক্ষতিকর পোকামাকড় মারা যেত। এছাড়া ঢ্যাপ বাড়ানোর উৎসবে একত্রে অনেক লোক খেতের পাশে, বাড়িতে বা রাস্তার পাশে ঢ্যাপ বাড়ালে উচ্চ শব্দের তৈরি হত। যার ফলে ফসল নষ্টকারী ইঁদুর ও হাঁস-মুরগির জন্য ক্ষতিকর শিয়াল ভয়ে পালিয়ে যেত। লোক উৎসবের মাধ্যমে এই সমাজের মানুষের প্রাকৃতিক এ কৌশলটির বিষয়ে জানা যায়।

৩. বজ্রপাতের থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল : সাম্প্রতিককালে বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শত শত বছর পূর্বে গ্রামের সাধারণ মানুষের অসাধারণ পদক্ষেপে এই সংকটটি অতীতে প্রকট আকার ধারণ করেনি। লোক উৎসবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীতে মানুষ তালের আঁটি খেতের সীমানা বরাবর রোপণ করত। যার ফলে বজ্রপাতে মানুষ কম মারা যেত। বজ্রপাতের মত কঠিন সংকট সমাধানে অসাধারণ চিন্তা এই সমাজের মানুষের বিচক্ষণতারই পরিচয় বহন করে।

৪. বৃক্ষভিত্তিক আদিজ্ঞান : সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত গাছ বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য করছে। এই অঞ্চলে প্রাচীন সমাজে গাছের প্রতি সম্মান জানানো হতো। ফুলঢালা উৎসবে দেখা যায় যে, গাছকে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। গাছের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হয়। এ অঞ্চলে কোন কোন গাছকে পূজা করতেও দেখা যায়। আমাবতী উৎসবে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রতি করুণা ও ভালোবাসা থেকে আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ থেকে পরবর্তী তিন দিন বা ৭ দিন মাটি কাটা বা খোঁচা বন্ধ থাকে। প্রকৃতির প্রতি এই ভালোবাসা সত্যিই অসাধারণ।

৫. পেশা ও আর্থিক অবস্থা : বিভিন্ন লোক উৎসবের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থার বেশ কিছু পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : কৃষক, কারিগর, মাঝি, মৌয়াল, দুধ বিক্রেতা, জেলে, কাঠুরে, গাছি, শ্রমিক প্রভৃতি। তৎকালীন সমাজের আর্থিক অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, মাঝির আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। নৌকাটি ভাঙ্গা ও জীর্ণ ছিল। তার জীবিকা অর্জনের একমাত্র সম্বল নৌকাটি মেরামতের ও খরচ তার কাছে ছিল না। যা মাঝি ও যাত্রীর গানে ফুটে ওঠে। অন্যদিকে অধিক ফসলের কথা জানা যায়। যা আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। সমাজের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাতে অতি দরিদ্রতা বা দুর্ভিক্ষের বিষয়টি নেই।

৬. কৃষিকাজের কৌশল : এ সমাজের মানুষের কৃষি কাজের কৌশল সম্পর্কে জানা যায় বিভিন্ন লোক উৎসবের মাধ্যমে। শুষ্ক মাটি আষাঢ় মাসে বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেলে তারা চাষ না করে কিছুদিন রেখে দিত মাটি বেশি উর্বর হতে সময় দিত। বৃষ্টির পানি ধরে রেখে ফসল ফলানোর কৌশল তারা আয়ত্ত করেছিল। পোকামাকড় ও ইঁদুরের হাত থেকে ফসল রক্ষার কৌশল তাদের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

৭. সুন্দরবন সংলগ্ন মানুষের জীবনচিত্র : এ সমাজের মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস সুন্দরবন। মধু সংগ্রহ করা, গোলপাতা কাটা, কাঠ কাটা, মাছ ধরা প্রধানত পেশা হিসেবে দেখা যায়। সমুদ্র আর সুন্দরবনের হিংস্র পশুর সাথে সংগ্রাম করে টিকে আছে এ অঞ্চলের মানুষ। এখানে খুলনার অন্যান্য স্থানের মতো অন্য লোক উৎসবগুলো কম হয়। সুন্দরবনের প্রবেশের ক্ষেত্রে বনবিবিকে তুষ্ট করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেখা যায়।

৮. লোক উৎসব : বিভিন্ন লোক উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়। যেমন পৌষ মেলা, বৈশাখী মেলা, নবান্নের মেলা প্রভৃতি। মেলা হচ্ছে মানুষে মানুষে মিলনের অন্যতম ক্ষেত্র। মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামের লোক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মেলা

দেখার নিমন্ত্রণ দেয়। বিবাহিত মেয়েদের নাইওর আনা হয়। মেলাতে পাওয়া যায় মাটির পুতুল, হাড়ি, কলস ইত্যাদি। কাঠের, বাঁশের ও বেতের তৈরি ঘর গৃহস্থলীর যাবতীয় সামগ্রী মেলাতে পাওয়া যায়। বর্তমানের মতো অতীতকালে বড় বড় বাজার ও সুপার শপ ছিল না। তখন ঘর গৃহস্থলীর সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিস মেলা থেকে কিনতে হত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার জন্য বর্ষাগম, তেমনি বিশেষভাবে পল্লী হৃদয়কে ভরিয়ে দেবার উপর্যুক্ত অবসর মেলা" (মিহির, ২০০৭ : ৩৫)।

৯. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : লোক উৎসব কোন বিশেষ ধর্মের না। ঐতিহ্য অনুসারে এবং আনন্দ লাভের জন্য লোকজ জীবনের সব ধর্মের, জাতির ও বর্ণের মানুষ লোক উৎসব পালন করে। লোক উৎসবকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক ঐক্য। খুলনা অঞ্চলের সমাজ জীবনে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সামাজিক ঐক্যের বীজ বপন করেছে লোক উৎসব। এ সমাজে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ধর্মের ও বর্ণের মানুষ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকে বসবাস করছে। ধর্ম বা জাতপাত নয় মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালোবাসার শিক্ষাটা এ সমাজের মানুষ পেয়েছে লোক উৎসবের কাছ থেকে।

উপসংহার

কৃষিভিত্তিক খুলনা জনপদের লোকউৎসবের মধ্যে বুড়ির খুটো, গাম্বী, সারাইন উৎসব মূলত ধান উৎপাদনের সাথে জড়িত। অধিক ফসল উৎপাদনের প্রত্যাশায় এই লোকাচারগুলো মানুষ পালন করে থাকে। বন্ধ্যা গাছের ফল উৎপাদন প্রত্যাশার যোগ গাম্বীর মৌল প্রণোদনা। ব্যাঙের গীত আয়োজন করলে বৃষ্টি নামবে এমন বিশ্বাসের লক্ষ্যও কৃষি। বনবিবির তুষ্টির জন্য যে লোকাচারগুলো পালিত হয় তা বননির্ভর পেশাজীবী-শিকারী, কাঠুরে, মৌয়াল প্রভৃতি পেশার মানুষের নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এই লোকাচারগুলো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পালন করে যা ধর্মীয় সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অজ্ঞতা, ভীতি ও সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মানুষ এসব উৎসব আয়োজন করে। প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের অসহায়তাও এর আরেকটি কারণ। বিশ্বায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে মানুষের ইহজাগতিক বোধবৃদ্ধির ফলে এসব লোকউৎবের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। আনন্দের শত উৎসের দুয়ার খুলে যাওয়ায় মানুষ ভিন্ন মাধ্যমে বিনোদন খুজঁছে। এমন ক্ষয়িষ্ণু সময়ে এসব লোক উৎসবের সংরক্ষণ ও বিস্তারে নীতিনির্ধারকদের বিশেষ মনোযোগ একান্ত আবশ্যক।

সহায়কপঞ্জি

অমলেন্দু মিত্র (১৯৭২)। *রাঢ়ের সংস্কৃতি*। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

আতোয়ার রহমান (১৯৮৫)। *উৎসব*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬২)। *বাংলার লোক সাহিত্য-১ম খণ্ড*। ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলিকাতা।

ওয়াকিল আহমেদ (২০১২)। *বাংলার লোক সংস্কৃতি*। গতিধারা, ঢাকা।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৯৫২)। *বাংলার পালা-পার্বণ*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

জসীম উদদীন (১৯৬৪)। *জীবন কথা-১ম খণ্ড*। পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।

তুষার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৫)। *লোক সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*। মুখার্জী অ্যান্ড কোং, লিমিটেড, কলিকাতা।

দুলাল চৌধুরী (২০০৪)। *লোক উৎসব*, বাংলার লোক সংস্কৃতি বিশ্বকোষ। আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা।

নাঈমুল ইসলাম (২০২০)। *বাংলাদেশের উৎসব*। বুকলাইন, ঢাকা।
পরিমল ভূষণ কর (২০০১)। *সমাজতত্ত্ব*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আদমশুমারী ২০১১, ঢাকা।
ফাহমিদা হক (২০০৭)। *বাংলার লোক উৎসব বেড়া ভাসান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মিহির চৌধুরী কামিল্যা (২০০৭)। *বাংলার লোক সংস্কৃতি : স্বাদে আস্বাদে*। অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।
মোমেন চৌধুরী (২০০৩)। *লোক উৎসব*, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-১২। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
শঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯৭২)। *বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি*। ইন্ডিয়ান পাব্লিকেশানস, কলিকাতা।
শামসুজ্জামান খান (২০১৪)। *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : খুলনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
Tamonash Chandra Dasgupta (1935). *Aspects of Bengali Society from old Bengal Literature*. University of Calcutta, Calcutta.